দৈনিক
জনকণ্ঠ

21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনগুলো কি সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে?

কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের পক্ষে বড় উকিল আদালতে দাঁড়ালেই কি দুর্বৃত্তের শত খুন মাফ হয়ে যায়? ম্যাজিস্ট্রেট কি 'বড় উকিল' দেখেই খুনীকে মাফ করে দেন? ছোট এক জেলা শহরের আদালতে খুনীর পক্ষে হাইকোর্ট থেকে 'ভাড়া করে' আনা এক বিজ্ঞ প্রবীণ উকিলকে দেখে প্রশ্নগুলো জেগেছিল মনে। এক সময় ছিল যখন চিহ্নিত খুনী বা সন্ত্রাসীর মামলা গ্রহণ করতেন না অনেক আদর্শবাদী আইনজীবী। এখনও বিভিন্ন বারে এ ধরনের আইনজীবী আছেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে এঁদের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। তবুও শুধু অর্থের জন্য হাইকোর্টের এক আইনজীবী চিহ্নিত সন্ত্রাসীর পক্ষে আদালতে হাজিরা দিতে এসেছেন দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এঁরা এখন সন্ত্রাসীদের 'ত্রাণকর্তা' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এঁদের ভরসায়ই সন্ত্রাসীরা অবাধে বিচরণ করছে সর্বত্র। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। চালাচ্ছে খুন আর রাহাজানি। আইনের দোহাই দিয়ে এইসব উকিল সন্ত্রাসীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অধিকার হরণ করছেন। হরণ করছেন গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের চলাচলের অধিকার। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের সহায়তা দিচ্ছেন। নষ্ট করছেন শিক্ষার পরিবেশ।

একটি তরুণের চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। '৭৪, '৭৫ সালে রাজনীতির নামে এই তরুণ গঠন করেছিল একটি সন্ত্রাসী দল। বেশ কিছু অস্ত্র আর বোমা নিয়ে সে শুরু করেছিল তার কর্মকাণ্ড। বিভিন্ন গ্রামের নিরীহ মানুষের ওপর গভীর রাতে সে তার দলবল নিয়ে চড়াও হতো। টাকা-পয়সা সহায়-সম্পত্তি নিয়ে সে চম্পট দিত। আস্তে আস্তে সে হয়ে উঠেছিল বড়সড় এক সন্ত্রাসী। প্রতিপক্ষের বাড়িতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে সে খবর দিত পুলিশে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষকে সে নিদারুণ কষ্ট দিত। তাই গ্রামের সকল মানুষ তাকে যমের মতো ভয় করত। কখন সে কাকে ফাঁসিয়ে দেয়। এমনিভাবেই চলছিল। আস্তে আস্তে একাধিক খুনের মধ্য দিয়ে এই ক্ষুদে সন্ত্রাসী পূর্ণতা লাভ করে। তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার জন্যই দুই স্থানীয় তরুণকে সে রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়া সে মিজান ও নিজাম আহমদ নামে দুই তরুণকেও হত্যা করে নদীর ধারে। নিজামের মা আজও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করছেন। এরপর অবশ্য সেই সন্ত্রাসী তরুণ গ্রেফতার হয়েছিল। বিচারও হয়েছিল তার। খুনের দায়ে শাস্তি হয়েছিল। কারাগারে শুরু হয়েছিল তার সাজা লাভের পালা। তার সাজা লাভের মেয়াদপূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই উকিলদের কারসাজিতে একদিন দেখা গেল খুনের সাজাপ্রাপ্ত আসামীও অবাধে বেরিয়ে এসেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাত গ্রামের মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। নিভৃত ঐ পল্লীতে আবার শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস, হানাহানি, দলাদলি, বিভেদ আর বিশৃঙ্খলা।

সম্প্রতি এই সন্ত্রাসীর শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে পল্লী এলাকায় গড়ে ওঠা এক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ওপর। সে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে, স্কুলটি বন্ধ করেই ছাড়বে। সাত গ্রামের মানুষের গর্ব এ স্কুল। তারাও রুখে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ধুরন্ধর ও জটিল প্রকৃতির মানুষ এই সন্ত্রাসী কোথা দিয়ে কি করে কেউ বুঝতেও পারে না। হাল আমলে সে অত্যন্ত সংগোপনে স্কুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ তুলে ডিসি, ইউএনও, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন বিভাগে নানা ধরনের উদ্ভট চিঠি দিল। এই চিঠির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দফতর থেকে স্কুলের কর্মতৎপরতা ও হিসাব-নিকাশের তদন্ত হলো। কিন্তু কোন অনিয়ম ও দুর্নীতি পাওয়া গেল না কোথাও। ব্যাংক কর্মকর্তা ও শিক্ষা অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে উক্ত সন্ত্রাসীর দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। এমনিভাবে এ সন্ত্রাসী স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে।

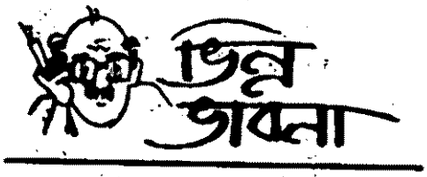

বোরহান আহমেদ

হয়রানি করছে গ্রামবাসীদেরও। দিনের পর দিন এমনি চলছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছেও ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। থানায়ও। অথচ সবাই নীরব। এই সন্ত্রাসী অতি সম্প্রতি স্কুল সংলগ্ন একটি জমি দখল করে নিয়ে সীমান্ত চিহ্ন দিয়ে চলে গেল। জমিটিতে স্কুলের মেয়েরা খেলাধুলা করত। অথচ এই জমির মালিকরা এখন ভারতে বহাল তবিয়তে ব্যবসা করছেন। মিথ্যা মালিক সাজিয়ে জাল দলিল করে দখল করছে এই সম্পত্তি। এর পিছনে রয়েছে এক উকিলের দুরভিসন্ধি।

খোদ রাজধানীর ঢালকানগর স্কুলটির ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্কুলটিকে নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলাই না হলো এতদিন। জাদরেল এক উকিল দুই নম্বর কাণ্ড করে পুরো স্কুলটা আত্মসাত করে নিয়েছিল নিজের নামে। তারপর আইন-আদালতের ফাঁকফোকর দিয়ে দখল করে নিয়েছিল স্কুলটি। স্কুলের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়। দেয়াল আর দালান ভেঙ্গে সেখানে মার্কেট নির্মাণ করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন উকিল সাহেব। এলাকাবাসীর সংবিত ফিরেছিল ততক্ষণে। তারা জড়ো হয়েছিল স্কুলটিতে। জড়ো হয়েছিলেন অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় সুধীজন ও বিদ্যোৎসাহী মানুষ। সব অপকীর্তি ফাঁস হয়েছিল সংবাদপত্রের পাতায়। উকিলের সকল অপকীর্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপর ছাত্র আর জনগণের দাবির কাছে অর্ধগুণ্ড সেই উকিলের সকল অপচেষ্টা ধূলিসাত হয়েছিল। তারপর অনেক প্রচেষ্টা আর সংগ্রামের পর ঢালকানগর গ্রাইমারী স্কুলটি আবার মুখর হয়ে উঠেছিল। ছাত্রছাত্রীদের কলকোলাহলে ভরে উঠেছিল স্কুলটি। ক্লাস শুরু হয়েছে, শিক্ষকরা ছাত্রদের পাঠদানে মনোনিবেশ করেছেন আবার। স্কুলের জায়গা জমি দখলের ঘটনা শুধু ঢালকানগর স্কুলেই প্রথম নয়।

খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে গ্রাম-বাংলার নিভৃত এলাকায় বহু স্কুলের মাঠ আর জমি দখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে বহু ঘৃণ্য মানুষ। স্কুলের জায়গা দখলের জন্য বহু মানুষ স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। জাল দলিল অথবা ভুয়া মালিকানা দেখিয়েই তারা দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে স্কুল। বন্ধ করার চেষ্টা করছে গ্রাম-বাংলার অনেক স্কুল। দুর্বৃত্তদের কাছে নাজেহাল হচ্ছে স্কুলের শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী মানুষ। মংলা বন্দর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চারটি ক্লাস রুমের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে দু'বছর আগে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারের মতবিরোধের জন্য আজও স্কুল ভবনটি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। ফলে ছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এ ধরনের সমস্যার হাত থেকে ছাত্রীদের রক্ষা করবে কে? এমনি ধরনের বিচিত্র সঙ্কট বিরাজ করছে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কেউ শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে নানা ধরনের প্রতিকূলতা। এক জরিপে দেখা যায় গ্রাম-বাংলার ৬০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন আর শিক্ষার পরিবেশ নেই। বিরাজ করছে নৈরাজ্য। কোথাও আবার স্থানীয় টাউট সন্ত্রাসী অথবা সাজাপ্রাপ্ত খুনীও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করছে জটিল অবস্থা। এদের স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য করলে তারা পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে। আর সদস্য না করলে এরাই আবার স্বনামে বা বেনামে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে মিথ্যা কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে চিঠি দেবে বিভিন্ন অফিস-আদালতে। নানাভাবে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যদের লাঞ্ছিত করবে। দেশের ১০ হাজার স্কুলে আজ এমনি ধরনের বিচিত্র সমস্যা বিরাজ করছে। বহু স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে রয়েছে অসংখ্য মিথ্যা মামলা। এ পরিস্থিতিতে স্কুলের রেজাল্ট ভাল হচ্ছে না। পরিবেশও হচ্ছে দূষিত। এর প্রতিক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের ওপরও পড়ছে। সমগ্র দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমনি ধরনের নৈরাজ্য অবস্থা দেখে বিত্তবান মানুষ এখন তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠাচ্ছেন লেখাপড়ার জন্য। বহু সংখ্যক শিশু-কিশোর স্কুলের প্রথম অধ্যায় থেকেই বিদেশে পড়াশোনা করছে। এছাড়া আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন, গ্র্যাজুয়েশন ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলেও পড়াশোনা করছে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। শুধুমাত্র ভারতেই পড়াশোনা করছে দু'লাখের ওপর শিশু-কিশোর। এ ছাড়া আমেরিকা, কানাডা, সাইপ্রাস, স্পেন, জাপান, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও ফিলিপিন্সেও লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিদেশে পড়াশোনা করছে। এদের জন্য প্রতিবছর তিন হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে বিদেশে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও একই রকম। বিভিন্ন কারণে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বছরের অর্ধেকের বেশি সময় বন্ধ থাকে। পড়াশোনা হয় না। চলে সংঘর্ষ, মারপিট, ধর্মঘট। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নানা ধরনের রাজনীতিতে জড়িয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেয়ে অন্যের স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি বেশি যত্নবান। কেউ কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির চেয়ে এনজিও অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কনসালটেন্সির প্রতি বেশি মনোযোগী। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ অবস্থা চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত কি হবে? দেশের ভবিষ্যতই-বা কি দাঁড়াবে-তা কি কেউ ভেবে দেখছেন কখনও!

এ ধরনের উদ্ভট পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণের পথ কি? প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যই সর্বত্র টাউট, সন্ত্রাসীদের উদ্ভব ঘটেছে। দুর্নীতি মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। জেলা, উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অসহায় ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন দুর্বৃত্তদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই সর্বত্র সন্ত্রাসী দুর্নীতিবাজদের অগ্রাধিকার। রাজনীতি, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য সর্বাধিক। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই দেশে সৃষ্টি হবে ভয়াবহ পরিস্থিতি। শিক্ষাঙ্গনগুলোও সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে।